রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামাজিক বিপ্লবের স্বরূপ

(evsjv-bengali-البنغالية)

সিরজুল ইসলাম আলী আকবর

সম্পাদনা: চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿ محمد صلى الله عليه وسلم والتغيير الاجتماعي ﴾

(باللغة البنغالية)

سراج الإسلام علي أكبر

مراجعة : أبو الكلام أزاد

2009 - 1430

islamhouse.com

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামাজিক বিপ্লবের স্বরূপ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে?

আমরা সকলেই জানি যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে আমরা ইঙ্গিত করি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর মাধ্যমেই নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। রুদ্ধ হয়ে যায় রিসালাতের সিলসিলার সব দুয়ার। অতঃপর আর কোন নবীর আগমন হবেনা, আসবেন না আর কোন রাসূল।

কেননা আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় মানুষের বসবাস শুরু হওয়ার সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে মানুষের জন্য জীবন বিধান নাযিল করার মাধ্যম হিসেবে যে নবী রাসূলগণকে পাঠানো শুরু করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মাধ্যমে নাযিল করা জীবন-বিধান আল-কুরআনুল কারিমই হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। অন্য কথায় জীবন বিধান হিসেবে যে নেয়ামত আল্লাহ নাযিল করেছিলেন, তা এই কুরআন নাযিল হওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত সকল কালের সকল মানুষের জন্য যে জীবন বিধানের প্রয়োজন, তা এই আল-কুরআনুল করীমেই বিধৃত। এর মাধ্যমেই মানুষের সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে, পাওয়া যাবে সকল মানুষের সর্বপ্রকারের সমস্যাবলীর যথার্থ সমাধান। পরবর্তীতে এমন কোন সমস্যারই সৃষ্টি হবেনা, যার নির্ভুল সমাধান এই কুরআনুল করীমে পাওয়া যাবেনা। তাই আল্লাহর নিকট থেকে নতুন করে কোন কিতাব নাযিল হওয়ার আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকল না। থাকল না নতুন কোন নবী বা রাসূল আগমণের প্রয়োজনীয়তা। এরশাদ হচ্ছে -

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. (المائدة : 3)

আজকের দিন তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম, সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত এবং তোমাদের দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (মায়েদা: ৩)

وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. (الأحزاب : 40)

তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। সূরা আহযাব : ৪০

সমাজিক বিপ্লব বলতে কি বুঝায়?

সকলেই জানেন বিপ্লব অর্থ আমূল পরিবর্তন, যে জিনিসটি যেভাবে যে অবস্থায় ছিল সে জিনিসটিকে সে অবস্থায় না রেখে-সে অবস্থায় থাকতে না দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতরভাবে ও ভিন্নতর অবস্থায় গড়ে তোলা। আর সামাজিক বিপ্লব বলতে বুঝায়, মানুষের সমাজবদ্ধতাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়া।

যে চিন্তা-বিশ্বাস ও আদর্শের উপর একটি সমাজ চলে আসছে তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে ভিন্নতর চিন্তা বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজটিকে গড়ে তোলা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত এবং যে সামষ্টিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে গঠন ও পরিচালনা এবং ভিন্নতর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা।

বস্তুত সমাজ বলতে মানুষের সামষ্টিক জীবন বোঝায়। মানুষের জন্য সমাজ ও সামষ্টিক জীবন অপরিহার্য। কেননা মানুষ পশু নয় পশুর বংশধরও নয়, বন্য জীবন মানুষের প্রকৃতি

পরিপন্থি। এজন্য সমাজতত্ত্ববিদগণ মানুষকে সামাজিক জীব বলে অভিহিত করে আসছেন চিরকাল ধরেই।

মানব সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীর সম্মিলিত দাম্পত্য জীবন যাপন শুরুর মাধ্যমে পরিবারের ভিত্তি রচিত হয় এবং পূর্ণত্ব লাভ করে সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়ের সমন্বয়ে। এই পরিবারসমূহের সু-সংবদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত হয় সমাজ। আর সমাজ পূর্ণতা লাভ করে তার অনিবার্য ও অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা- রাষ্ট্র, প্রশাসন, বিচার, অর্থোৎপাদন ও বন্টন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে।

এ হচ্ছে একটি সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো ও সম্পূর্ণ রূপ। সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতা অপরিহার্য। কোন-না কোন আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ও তার অবিচল অনুসারী হতে হয় সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে। সেই আদর্শই একজন পুরুষ ও একজন নারীকে সংযুক্ত করে দম্পতিরূপে। আর দাম্পত্য জীবনের ফলেই বৈধ সন্তান সন্ততির অস্তিত্ব সম্ভব ও স্বীকৃত। সেখানেই পুরুষ হয় সন্তানের পিতা, নারী হয় সেই পুরুষের স্ত্রী এবং সন্তানদের জননী। সেখানেই হয় ভাই ও বোন, দাদা ও চাচা। এই সবের সমন্বয়ে গঠিত পরিবারের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত সেই আদর্শ। সেই আদর্শই পরিবারে পিতার মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারণ করে, স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। স্বামীর যেমন অধিকার ও মর্যাদা থাকে স্ত্রীর উপর, তেমনি স্ত্রীরও মর্যাদা ও অধিকার স্থিরীকৃত হয় স্বামীর উপর। পিতা হিসেবে সন্তানের উপর মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত হওয়ার সাথে সাথে সন্তানের সন্তান, মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত হয় পিতা ও মাতার উপর। অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য ও নির্ধারিত হয় সর্ব পর্যায়ে ও পারস্পারিকভাবে।

এই মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারিত হওয়া এবং যথাযথভাবে অনুসৃত ও পালিত হওয়া একটি নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট এবং সকলের নিকট মৌলিক গৃহীত পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ভিত্তিতেই সম্ভব। অন্য কথায়, একটি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পরিবার সমূহের সমন্বয়েই গঠিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ। এই পূর্ণাঙ্গতা সে লাভ করে তার জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান (Institution) সমূহের মাধ্যমে। অর্থাৎ সমাজকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং ক্রমশ বিকাশের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একান্তই অপরিহার্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক সরকার (State and Government)। এই রাষ্ট্রকেই সমাজের লোকদের জীবন-মান-সম্মান-সম্ভ্রম ও ধন-মালের নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়।

পারস্পারিক বিবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রভাবমুক্ত একটি নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গঠন করতে হয়। জনগণের বৈষয়িক জীবনের সুষ্ঠুতার জন্য এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হয় যা দ্বারা প্রতিটি নাগরিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করবে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে পারবে সকল প্রবঞ্চনা ও শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে। সমাজের লোকদের প্রতিভা স্ফুরণ ও বিকাশ সাধনের জন্য ভদ্র, শিষ্ট মানবিক জীবন যাপনের যোগ্য বানানোর জন্য এবং ভবিষ্যত বংশধরদের উন্নতমানে গড়ে তোলার জন্য একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও চালু রাখতে হয় এ সবই একটি সমাজের পূর্ণত্বের জন্য অপরিহার্য শাখা-প্রশাখা। কিন্তু এর কোন একটি প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে এবং সার্বিকভাবে গড়ে উঠতে ও চলতে পারেনা একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে পুরাপুরিভাবে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠিত না করে। একটি একক আদর্শই ব্যক্তিতে-

ব্যক্তিতে ও পরিবারে, পরিবারে-পরিবারে ও সমাজে, সমাজে-সমাজে ও রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রে ও প্রশাসনে, প্রশাসনে ও বিচার ব্যবস্থায়, সমাজ-রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে, সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিখুঁত সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করতে পারে। এই আদর্শই হয় নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় ও তার সমস্ত শাখা-প্রশাখার আসল নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক। এ দৃষ্টিতে সামাজিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজের উক্ত সকল দিকে ও বিভাগে আমূল আদর্শিক পরিবর্তন সাধন। যে আদর্শ, রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা নিয়ে একটি সমাজ চলতে থাকে, সমাজটিকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ভাবধারা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি ভাবধারা ও আদর্শের উপর নতুনভাবে গড়ে তোলাই হয় সমাজ বিপ্লবের কাজ। সমাজ জীবনে আদর্শের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট ও সর্বজন গৃহীত একটি আদর্শ ছাড়া সমাজ সম্পর্কে কোন ধারণা (Conception)-ই গ্রহণ করা যেতে পারেনা সেরূপ একটি আদর্শ ব্যতিরেকে কোন সমাজ গড়ে উঠতে ও চলতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। সমাজ তো হাওয়ার উপর দাঁড়াতে পারে না। কোন জমিনে বিপুল সংখ্যক পুরুষ-নারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ বাস করলেই সে জমিনটাকে সমাজ বলা হয় না- সমাজ বলা যায় না এই বিচিত্র লোকদের ভিড় বা সমাবেশকে। সমাজ বললেই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানুষের একটি সু-সংবদ্ধতা-একটি সু-সংবদ্ধ দল বোঝায়। কোন আদর্শ ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের মধ্যে সু-সংবদ্ধতা আসতেই পারেনা, সেজন্য একটি আদর্শ অপরিহার্য। অবশ্য সে আদর্শ ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা যেমন ভাল হতে পারে, তেমনি মন্দ বা ভুল আদর্শ হতে পারে। আদর্শ ভাল হলে ভাল ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে, আদর্শ ভুল ও মন্দ হলে মন্দ সমাজ-বিভ্রান্ত অসুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে এতো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। একটু আগে একক আদর্শের কথা বলছি বস্তুত সর্বাঙ্গীন সমাজ কাঠামোর যে চিত্র ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি তা একটি মাত্র আদের্শর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সমাজের বিভিন্ন দিক বিভাগ ও শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বিত ও অনুসৃতহলে সামাজিক সু-সংবদ্ধতা অকল্পনীয়।

শুধু তাই নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশ ও শাখা-প্রশাখার মধ্যে প্রচণ্ড দন্দ্ব এবং পরিণামে পারস্পারিক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে বিভিন্ন আদর্শ কিংবা আদর্শিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভিন্নতার কারণে। তাই একটি নির্দিষ্ট আদর্শকে ভিত্তি করে ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ, সমাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা- রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, বিচার, অর্থ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলাই সমাজ গঠনের বিজ্ঞান প্রক্রিয়া। এর ব্যতিক্রম হলে সমাজ সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠতে পারে না, গড়ে উঠলেও স্থির ও স্থায়ী থাকতে পারেনা একথা অনস্বীকার্য। আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গঠনের এই দার্শনিক আলোচনা পর্যায়ে আমাদেরকে দুটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

প্রথমঃ সমাজকে তার পুরাতন আদর্শ রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ নতুন একটি আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। মুখে প্রচলিত আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির দোষ-ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি চিহ্নিত করে নতুন বা ভিন্নতর একটি আদর্শ, তার বৈশিষ্ট ও কল্যাণকর অবদানের কথা বলে দিলেই সমাজের লোকেরা আবহমানকাল থেকে গৃহীত অনুসৃত ও অভ্যাস-আদর্শ পরিত্যাগ করে নতুন আদর্শ ঝড়ের বেগে গ্রহণ করে তার অনুসরণ করতে শুরু করে দিবে তা কল্পনা করা যায়না। বাস্তবে তা সম্ভবও হতে পারে না। সে জন্য আদর্শ ভিত্তিক বিপ্লব সৃষ্টির উদ্যোগীকে আদর্শিক বিশ্বাসের দৃঢ়তা কর্ম প্রেরণার অবিচলতা ও প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলায় অনমনীয়তা এবং সর্ব প্রকারের ত্যাগ-তিতিক্ষার ধারক হতে

হবে। ঘাত-প্রতিঘাত, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা নীরবে সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় (Devotion), অন্যথায় তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

দ্বিতীয়ঃ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর বা নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেহায়েত গায়ের জোরে বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। সেজন্য যে কাজটি করতে হয় তাকে ইংরেজীতে বলা হয় (Motivation)। অন্যকথায় সমাজে আদর্শিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্য গোটা সমাজকে- ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সরকার, বিচার বিভাগ,অর্থ বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, যা নিতান্ত জোর-জবরদস্তি ভয়ভীতি, চাপ সৃষ্টি ও প্রলোভন দ্বারা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। সেজন্য একদিকে বিদ্যমান সমাজিক অবস্থার অবক্ষয়, হীনতা, কদর্যতা, বীভৎসতা স্পষ্ট করে সমাজের লোকদেরকে ভাবিত ও চিন্তান্বিত করে তুলতে হবে, সেই সাথে অপরদিকে নতুন আদর্শের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-মহিমা-মাহাত্ম্য ও কল্যাণকর অবদানের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে পেশ করে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্বিশেষে ও উদার-উন্মোক্ত আহবান জানাতে হবে। এভাবে আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, অবিশ্রান্ত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালাতে থাকতে হবে এক সাথে দ্বিমুখী কর্মধারা। একটি হচ্ছে বিস্তার ও সম্প্রসারণ (Expansion) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুদৃঢ় ও সু-সংবদ্ধকরণ (Consolidation)। এটা আদর্শ প্রতিষ্ঠার বা আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির কাজ করেছেন, তাতে আমরা এই বৈজ্ঞানিকতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রকটরূপে দেখতে পাই। তাই বলতে পারি যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামাজিক বিপ্লব প্রক্রিয়ার এই-ই হচ্ছে স্বরূপ।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে সমাজ

আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী ভূ-খন্ডের প্রসিদ্ধ নগর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানেই তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন। এই নগরের অধিবাসীরা একটি প্রাচীনতম সমাজের উত্তরাধিকারী। ঐতিহাসিকভাবে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) এর বংশধরদের দ্বারা, যদিও প্রায় সেই একই সময়ে আরও কোন কোন বংশের লোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের সময়কালীন আরব উপদ্বীপের একটা মুটামুটি চিত্র তুলে ধরার জন্য বলতে হচ্ছে এই সময়ের আরবরা নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যভিচার, মদ্যপান ও জুয়াখেলা ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। নির্মমতা ও স্ব-কল্পিত আত্মম্ভরিতা তাদেরকে সন্তান হত্যার বীভৎসতা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। ছিনতাই অপহরণ ও কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টি ও ধন-সম্পদ লুটে-পুটে নেয়াই ছিল তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা। নারী সমাজ ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত ও মানবিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তারা পশুকুল ও বস্তুসম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হত। বহু প্রকারের খাদ্য কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যা নারীদের খাওয়ার অধিকার ছিল না। পুরুষরা অসংখ্য নারীদের ভোগ করার স্বাধীনতা ভোগ করত, নারী পুরুষদের অবাধ মেলামেশা ও নাচ গান, ফূর্তিতে তারা মশগুল হয়ে থাকত। দারিদ্র ও খাদ্যাভাবের চিন্তায় তারা সন্তান হত্যা করত।

জীবন্ত সন্তানকে সূতিকাগারে গলা টিপে বা অন্যভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হত। আর যে সন্তানকে সূতিকাগারে হত্যা করা কোন কারণে সম্ভব হত না, পরবর্তীকালে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

যে সমাজে জনগণের জীবন গোত্রভূক্ত। আর গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষ রক্তক্ষয়ী অবস্থার সৃষ্টি করত। গোত্রসমূহের মাঝে একবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তা বংশানুক্রমিকভাবে ও শত শত বছর ধরে চলত, আর তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিঃশেষ হয়ে যেত।

তখনকার আরব দেশে আধুনিক ধরণের কোন রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা ছিল না। পারস্পারিক বিবাদ মীমাংসা বা মজলুমের ফরিয়াদ শোনার জন্য কোন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বা বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য কোন সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছিল না, কোন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ছিল না, কর ধার্য ও আদায় করার জন্য অপরাধীর বিচার ও শাস্তি দানেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন ব্যক্তির কোন অধিকার বা মর্যাদা সুরক্ষিত ছিল না। কেউ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তা ফিরিয়ে দেয়ারও কেউ ছিল না। এক এক গোত্রের অন্তভূক্ত লোকদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না অপরাপর গোত্রের লোকদের সঙ্গে। মানুষ ছিল মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরের পশুকূলের মতো লাগামহীন। গোত্রের সর্বাধিক প্রবীন ব্যক্তি (যে অধিক ধন-সম্পদের মালিক ও সমধিক প্রভাবশালী)-কে গোত্রের সরদার বানানো হত। কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বেশী হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেলে এক একটি শাখা-গোত্র স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গোত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। এভাবে গোত্র ব্যবস্থা সমগ্র আরবে বিস্তৃত ও সমপ্রসারিত হয়ে পড়েছিল। গোত্র ব্যবস্থায় কোন গোত্রের একজন লোক যদি অন্যায় করত অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তির সাথে তাহলে তার গোত্রের সব লোক তাকে পূর্ণ সমর্থন দিত। প্রয়োজন হলে তার জন্য যুদ্ধও শুরু করে দিত।

তখন মক্কা তথা গোটা আরবে প্রচলিত ছিল মূর্তি পূজার ধর্ম (দীন)। আমর ইবনে লুহাই নামের খুজারী বংশের এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে এই মূর্তি পূজার পদ্ধতি কাবাগৃহে এনে স্থাপন করেছিল। ভাগ্য গণনার জন্য বা কাজের ভালো-মন্দ ফল জানবার জন্য তারা তীর ব্যবহার করত এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। লাত, মানাত, হুবল, ওজ্জা প্রভূতি ছিল কুরাইশ বংশের সেরা মূর্তি। তারা এসব মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য সেগুলোর সামনে পশু বলি দিত। লেখাপড়াও জ্ঞান চর্চার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক নিজস্ব চেষ্টা ও উদ্যোগে কিছু পরিমাণ লেখা-পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলা যায়, মক্কা ছিল একটি নগর, যেটি জীবন-ধারা, সামাজিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ বাল্যাবস্থায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে মক্কা যাযাবরত্ব (Nomadism) থেকে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল বলা যায়। তবে সেই সভ্যতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধতায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়- তদানীন্তন সমগ্র দুনিয়া, বিশেষ করে গোটা আরব উপদ্বীপ ছিল প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর মক্কা নগরের অবস্থান ছিল সূচিভেদ্য অন্ধকারের নিম্নদেশে। অথচ এ নগরেই আল্লাহতায়ালা তাঁর সবশেষ নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু কেন?

আরব উপদ্বীপ ও মক্কা নগরে শেষ নবীর জন্ম হল কেন?

শিরক, পৌত্তলিকতা, যাযাবরত্ব ও নৈতিক অধঃপতনের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে সবচাইতে বেশী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তদানিন্তন আরব উপদ্বীপ এবং বিশেষভাবে মক্কা নগরী। আল্লাহ তাআলা এ নগরেই তাওহীদী নূর এর আবির্ভাবের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা

এই মক্কা নগরই ছিল সেই নূরের মুখাপেক্ষী সবচাইতে বেশী। আর আরবদের কতগুলো মৌলিক মানবীয় গুণ এমন ছিল, যার দরুণ আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা তাওহীদী আদর্শ ধারণ ও সমগ্র আরবে তার বিস্তার সাধনের মাধ্যম হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। তাদের হৃদয়-পাত্র ছিল স্বচ্ছ ও শুন্য, তখন পর্যন্ত তাতে কিছুই লিখিত হয়নি। তাই তাতে কিছু মুদ্রিত করা হলে তা সহজে মুছে যাবে না বলে আশা করা হয়েছিল। আরবরা ছাড়া তখনকার দুনিয়ার আপরাপর জাতি ও জনগোষ্ঠী নিজস্ব চিন্তা বিশ্বাস-দর্শন সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ। আরবের যে মূর্খতা ছিল, তা মুছে ফেলা ছিল সহজ এবং নতুন আকীদা ও বিশ্বাসের বীজ বপন করা হলে তাদের মেধা তাকে উৎকর্ষিত ও বিকশিত করতে ছিল পরাঙ্গম। তারা ছিল সরল-সোজা ও এক কথার মানুষ, যা বলতো তা করতে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এমনকি সেজন্য জীবন দিতে হলেও তাতে পিছপা হতনা আকাবার বায়আত করতে এসে আওস ও খাজরাজ বংশের লোকেরা বলেছিল আমরা আপনাকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাই আমাদের ধন-সম্পদের বিপদ ও আমাদের সেরা লোকদের জীবন নাশের ঝুঁকি সহকারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণমাত্রায় পূরণ ও রক্ষা করেছে তাতে একবিন্দুও ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা পর্ব

তখনকার দুনিয়া এবং বিশেষ করে আরব উপদ্বীপ ও মক্কার যে সাধারণ ও সর্বাত্মক বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল, তাতে মানবতার জন্য আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূলের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত তীব্র। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিছক কোন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাগুরু, দার্শনিক নিছক কোন ধর্ম প্রবর্তকের অথবা কোন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতার পক্ষে কিছুই করার ছিলনা। শুধু আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, কোন খারাপ অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন বা সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণই ছিল তখনকার মূল চাহিদা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন বা আরব উপদ্বীপ ও তার অরাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র ও রাজনীতি প্রবর্তন মৌলিক কাজ ছিল না। বলতে গেলে, এ ধরণের লোকের তেমন কোন অভাবও ছিল না, কিন্তু তাদের কারোর পক্ষেই আরব দেশের তখনকার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এই সময় প্রয়োজন ছিল সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াতের জগদ্দল পাথরের তলা থেকে বিশ্ব মানতাকে উদ্ধার করা, প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বিপ্লবের দায়িত্ব পালনের। প্রকৃত পক্ষে এর জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কার্যত তা পালন করে তাঁর উপর অর্পিত মিশন তিনি পুরামাত্রায় সফল করে গেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হলে এটাতো জানা এবং বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। কিন্তু তাঁকে কি কাজ করতে হবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং তা কিভাবে পালন করতে হবে, এ বিষয়ে তখন কিছুই জানা যায়নি। প্রথম ওহীর পর কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর সূরা আল-মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত একসঙ্গে নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿1﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿2﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿3﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿4﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿5﴾
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿6﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿7﴾

হে বস্ত্রাবৃত। উঠ অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোষাক-পরিচ্ছেদ পবিত্র কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা মুদ্দাস্‌সির : ১-৭)

এ আয়াত কয়টির মাধ্যমেই প্রথমবারের মত তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলঃ আপনি উঠুন এবং বিশ্বমানব যে পন্থা ও পদ্ধতিতে জীবন যাপন করছে, তার ভয়াভহ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিন। সজাগ, সচেতন ও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলুন। দুনিয়ার মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করুন এবং তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করে দিন। এই কাজটি যথার্থ ও পূর্ণ যোগ্যতা সহকারে সমাধান করার জন্য প্রথমে আপনার নিজের জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হতে হবে। আপনি সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থ ও সুবিধার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতা নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে মানব সাধারণের সার্বিক সংশোধন ও উন্নয়নের কাজে মনোযোগী হোন। মানুষের কল্যাণে আপনি যা কিছু করবেন তাদের নিকট থেকে তার বেশি পেতে চাইবেন না। নিঃসন্দেহে এ এক বিরাট কাজ এ কর্তব্য পালনে সুকঠিন অসুবিধা জটিলতা সমস্যা বিরুদ্ধতা ও শুত্রুতার সম্মুখীন হওয়া অবধারিত।

তাই এজন্য আপনাকে অশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে সে সব আপনাকে সহ্য করতে হবে আপনার রব এর জন্য। তাঁরই নির্দেশিত কাজ করতে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। এ আয়াত কয়টি থেকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামাজিক বিপ্লবের যে স্বরূপ বোঝা যায়, তা হচ্ছেঃ এটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নিজের পরিকল্পিত কোন কাজ নয় বরং স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত। এ কাজের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের উপর একমাত্র মহান আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এবং তার পূর্বে মানবীয় প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব উৎখাত করা। এ কাজ দুনিয়ায় প্রচলিত তথাকথিত রাজনৈতিক তৎপরতা ও ক্ষমতা দখলের কোন প্রতিযোগিতা নয়। এটা হচ্ছে নিজেকে ও বিশ্ব মানবকে সকল প্রকার শিরকের কলুষতা ও কদর্যতা থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ বান্দা বানানোর কাজ। আর সে জন্য নিছক ধর্ম প্রচারের পদ্ধতিতে কিংবা ক্ষমতা দখলের পদ্ধতিতে কাজ করলে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না, সেজন্য পরম ধৈর্য ও অনমনীয়- অন্যকথায় বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। বলা বাহুল্য এই হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আল্লাহ নির্দেশিত পদ্ধতি।

অতপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নির্দেশ পানঃ

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿214﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿215﴾ (الشعراء : 214-215)

আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর। (সূরা শুআরাঃ ২১৪-২১৫)

এ নির্দেশ পেয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নিজের ঘরে আমন্ত্রিত করে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। তখনও তার দাওয়াত ছিল সম্পূর্ণ প্রাথমিক এবং অত্যন্ত গোপন পর্যায়ের। এই সূচনা পর্বে তার দাওয়াতের সার নির্যাস ছিল এই মহা সত্য যে এই বিশ্বলোকে আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবী ও রাসূল, আর পরকাল অবশ্যই হবে, আল্লাহর সম্মুখে প্রতিটি মানুষকে ইহ জীবনের যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। সে অনুযায়ী তিনি শুভ পুরস্কার কিংবা কঠিন শাস্তির ফয়সালা করবেন, যা কার্যকর হওয়া থেকে কেউই নিস্কৃতি পাবে না। সেই সাথে তিনি মূর্তিপূজা ও

মানুষের দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এক আল্লাহর নিকট পূর্ণমাত্রায় আত্মসমর্পনের আহবান জানান।

এই প্রাথমিক ও গোপন পর্যায়ের দাওয়াত কবুল করে যাঁরা মুমিন সমাজে শামিল হন, তাঁদের মধ্যে মক্কার উচ্চ বংশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন তদানীন্তন সমাজের দরিদ্রতম ও ক্রীতদাস পর্যায়ের। যেমন পুরুষরা শামিল ছিলেন, তেমনি নারীরাও। তাঁদের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক লোক যেমন ছিলেন তেমন ছিলেন কম বয়স্ক বালকও। তাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ব্যবসায়ী, তেমনি ছিলেন বড় বড় যোদ্ধা ও সামরিক নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।

বিদেশীদের মধ্য থেকে ছিলেন সালমান ফারসী, সুহাইব রুমী ও বিলাল হাবশী প্রমুখ। এদের মধ্যে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম নামক ব্যক্তিও ছিলেন এবং সাফা পর্বতের উপরে অবস্থিত তাঁর ঘরটি ছিল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইসলামী দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রভিত্তিক দাওয়াতী কর্মকান্ডের ফলে আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তাওহীদী দীন কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এটা ছিল ব্যক্তিগতভাবে তাওহীদী দাওয়াতের পর্যায়। কেনান এ সময় পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে এক একজনকে এই দাওয়াত দিতেন এবং লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবেই তা গ্রহণ করতেন। এরপরই শুরু হয় প্রকাশ্য ও সামষ্টিক পর্যায়ের দাওয়াতী কার্যক্রম।

প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা-

অতপর তাঁর প্রতি দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হলঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿94﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿95﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿96﴾ (الحجر : 94-96)

সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব তারা অচিরেই জানতে পারবে। (হিজর : ৯৪-৯৬)

এই নির্দেশ পেয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার লোকদের সম্মুখে তাঁর শিরক পরিহার ও তাওহীদী আকীদা গ্রহণের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে পেশ করার উদ্দেশ্যে সাফা পর্বতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীকে সমবেত হওয়ার জন্য আহবান জানালেন। লোকেরা দ্রুত ঘর থেকে বাইরে এসে উপরের দিকে তাকিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেয়ে এ আহবানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিজ্ঞাসার জবাবে তারা এক বাক্যে বললঃ আমরা এ পর্যন্ত তোমাকে সত্যবাদী পেয়েছি তুমি মিথ্যা বলনা, কাউকে ধোঁকা দাওনা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পর্বতের উভয় দিকই সমানভাবে দেখছিলেন। ভেতরে জনবসতির দিক এবং বাইরের উন্মুক্ত দিক একই সাথে গোচরীভূত ছিল। কিন্তু পর্বতের পাদদেশের সমবেত জনতা কিছুটা ভেতরের দিকে থাকায় বাইরের দিক ছিল তাদের চোখের আড়ালে তারা মাত্র একটি দিকই দেখতে পাচ্ছিল। মূলত জ্ঞান ও অবহতির দিক থেকে জনসাধারণ ও তাঁর মধ্যে এটাই ছিল পার্থক্যের মৌল বিন্দু। সাধারণ মানুষ শুধু হইকাল ও ইহজীবন্ত বস্তুগত দিকটিই দেখতে পায়, তাদের নিজস্ব জ্ঞান শুধু এই বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইহকাল-ইহজীবন তথা বস্তুজগত সম্পর্কিত জ্ঞান ও অবহতির সঙ্গে সঙ্গে পরকালীন জীবন তথা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন।
তিনি নিজের সত্যতা ও সত্যবাদিতার সাধারণ স্বীকৃতি আদায় করে বললেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿46﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿47﴾ (سورة سبأ)

বল, আমি তো তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুজন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতপর চিন্তা করে দেখ তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সেতো আসন্ন কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়। বল, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি, বরং তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর নিকট এবং তিনি সবকিছুর উপরই স্বাক্ষী। (সাবা : ৪৬-৪৭)

এই প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পর প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রুপ-উপহাস এবং পরে মারাত্মক শুত্রুতা শুরু হয়ে যায়। এই সময় খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি এবং তাঁর এই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত দুর্বল স্তরের মুমিনগণের উপর জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সবকিছুই নীরবে সহ্য করেছিলেন। দুর্বল স্তরের মুমিনগণ অত্যাচার-নিপীড়নে অতীষ্ঠ হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে ফরিয়াদ করতেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর তো সহ্য করতে পারছি না। অনেকে বলতেন, আপনি অনুমতি দিন আমরা এর মুকাবিলায় ওদেরই মত অস্ত্র ব্যবহার করি। অস্ত্র আমাদেরও আছে আর আমরাও তাঁর ব্যবহার করতে জানি। এসময় মক্কী সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমান হাবশায় (প্রাচীন আবিসিনিয়া বা বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করে যায়।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিরুদ্ধ পক্ষকে প্রতিরোধ করার অনুমতি দেননি। তিনি তাদেরকে শুধুই সবর অবলম্বন করে অবিচল হয়ে থাকার উপদেশ দিতেন। তার দুটি কারণ সুস্পষ্ট। প্রথম, তখন পর্যন- আল্লাহর নিকট থেকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়নি দ্বিতীয়, যে সামাজিক বিপ্লব রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লক্ষ্য, তাতে প্রথম পর্যায় হচ্ছে প্রশিক্ষণমূলক, উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তিদের গড়ে তোলা যাঁরা সত্য দীনের প্রতিষ্ঠায় হবেন অবিচল নির্ভরযোগ্য। বৈষয়িক স্বার্থ বা শত্রুদের নিপীড়ন কোন কিছুই তাদেরকে দীনের মহান আদর্শ থেকে বিরত বা বিচ্যুত করতে পারবেনা। আগুনে পোড়া স্বর্ণের খাটিত্ব যেমন নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য, কাঁচা মাটি নির্মিত ইট আগুনে জ্বালিয়ে পরিপক্ক করে তা দিয়ে যেমন পাকা দালান নির্মাণ করা হয় এ-ও ঠিক তেমনি। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামাজিক বিপ্লবের কার্যক্রমের স্বরূপ ছিল নির্ভীক বিপ্লবী ও আদর্শবাদী কর্মী বাহিনী ও অনমনীয় নেতা সৃষ্টির মাধ্যমে দীনি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সাধন নিছক নেতৃত্ব ও ক্ষমতার হাত বদল নয়। আদর্শতো বিমূর্ত (Abstract) ভাবমূলক নির্বস্তুক। তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য সেই ভাবধারার নির্ভরযোগ্য ধারক বাহক মানুষের প্রয়োজন।

আর সে মানুষ এরূপ একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই তৈরী করা যেতে পারে। ইতিহাস একাট্যভাবে সাক্ষ্য দেয়, প্রাথমিক পর্যায়ে

ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তিরা বাস্তবতার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) তাঁর পিতা ও মাতা, হাবশী গোলাম হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত, বনু মুমিনের ক্রীতদাসী লবীনা প্রমুখ প্রথম পর্যায়ের সাহাবীগণ এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁদের কেউ শাহাদাত বরণ করনে, আবার কেউ সব সয়েও বেঁচে ছিলেন। এই সময়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সমর্থনকারী বংশের অন্যান্য লোকেরা দীর্ঘ তিনটি বছর পর্যন্ত মক্কার কুরাইশগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে একটি গিরি গুহায় অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। এ সময়ে তাঁদের সাথে কেউ কোন সম্পর্ক রাখত না এবং কোন দ্রব্যও বিক্রয় করত না। তাঁর চাচা আবু তালেব তাঁকে মুশরিকদের সকল শত্রুতা থেকে আশ্রয় দিতেন। একদিন চাচা বললেনঃ ভাতিজা, ওদেরকে থামাতে পারছিনা। তোমার কাজ বন্ধ করলে ওরা তোমার নেতৃত্ব মেনে নেবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য এবং অপর হাতে চাঁদও তুলে দেয়, তবুও আমি আমার কাজ করতেই থাকব। তাতে আল্লাহ এ কাজে জয়ী করবেন কিংবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই তার পরোয়া নেই।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের এক পর্যায়ে তাঁর সম্মুখে প্রলোভনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কুরাইশ সরদার উতবা ইবনে রবীয়াকে পাঠিয়ে তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়ঃ তোমার এ কাজের লক্ষ্য যদি হয় ধন-মাল সংগ্রহ, তাহলে বল আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের সকলের তুলনায় সেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবে। যদি তুমি মান-মর্যাদা লাভের ইচ্ছুক হয়ে থাক, তাহলে আমারা তোমাকে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা বানিয়ে নেব। তোমার সিদ্ধান্ত আমরা সকলেই মেনে নেব। আর যদি তুমি বাদশাহ হতে চাও, তাহলে তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেব। আর যদি তোমাকে জ্বিন-পরীতে পেয়েছে মনে কর তাহলে বড় বড় চিকিৎসক দ্বারা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কথা চুপ করে শোনার পর সূরা ফুস্‌সিলাত(হা-মীমআস্‌ সিজদা) এর প্রথম থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন। এই আয়াতসমূহে কুরআন আল্লাহর নাযিল করা কিতাব হওয়ার, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হওয়ার, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিকট আল্লাহর ওহী আসার, যারা এই কালাম শোনে না, এর প্রতি ঈমান আনেনা তাদের মর্মান্তিক পরিণতি হওয়ার, যারা ঈমান এনেছে তাদের অপরিসীম শুভ ফল পাওয়ার, এই আসমান-জমিন মহান আল্লাহর সৃষ্টি হওয়ার, অতীতের যেসব জনগোষ্ঠী আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করেনি, তাদের উপর এই দুনিয়ায়ই কঠিন আযাব আসার, ঈমানদার লোকদের প্রতি সাহায্যকারী হিসাবে ফেরেশতা নাযিল হওয়ার, সমগ্র বিশ্বলোকের উপর একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব হওয়ার এবং কেবল তাঁরই বন্দেগী করার আহবান সম্বলিত নানা কথা রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তার যদি ধন-সম্পদের লিপ্সা থাকত, শুধু ক্ষমতা লাভই তাঁর ইচ্ছা হত, ক্ষমতায় আসীন হতে পারলেই তাঁর নিয়ে আসা বিধান বাস্তবায়িত করা সহজ ও সম্ভব হবে বলে যদি মনে করতেন তাহলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন না। কিন্তু তা গ্রহণ করলে আর যা-ই হোক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতনা। তাঁর রাসূল হওয়াই ব্যর্থ হয়ে যেত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের সার কথা ছিলঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿108﴾ (الشعراء : 108)

সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরা শুআরাঃ ১০৮)

অন্যকথায়, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরন কর। অর্থাৎ যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সমগ্র বিশ্ব জগতে সদা কার্যকর মানুষ সেই আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে পাওয়া জীবন বিধান অনুযায়ী আপন জীবন ও সমাজ গঠন করবে এটাই ছিল তাঁর সামাজিক বিপ্লবের মূল চাবিকাঠি। কেননা মানুষ যতদিন পর্যন্ত এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেবেনা ততদিন মানবীয় সমাজের ভিত্তিই রচিত হতে পারে না। ততদিন মানবীয় সার্বভৌমত্বই প্রবল ও প্রধান হয়ে থাকবে। মানুষ থাকবে মানুষের গোলাম হয়ে। আর তা-ই হচ্ছে মানবীয় সমাজের বিপর্যয়ের মৌল কারণ। আল্লাহকে ভয় করে রাসূলের নেতৃত্ব মেনে না নেয়া পর্যন্ত মানুষ কাফির-ফাসিক ও চরিত্রহীন লোকদের নেতৃত্ব মেনে চলতে বাধ্য হবে, আর তা-ই হচ্ছে সমস্ত অকল্যাণের মৌল কারণ। মুসলিম তথা ইসলামী সমাজের নাগরিক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তাই সর্বপ্রথম অন্য সব কিছুর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং অন্য সকলের নেতৃত্ব অস্বীকার করে এক রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নিতে হয় তাকে অকৃত্রিম বিশ্বাস সহকারে ঘোষণা করতে হয়।

বস্তুত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বিপ্লবী দাওয়াতই হচ্ছে তাঁর সামাজিক বিপ্লবের মূল প্রকৃতি। যে অবস্থায় সমাজ রয়েছে তাকে আমূল পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই বিপ্লবী দাওয়াত। তাঁর এ দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত সমাজকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছে তার অন্তঃসার শূন্যতাকে লোক সম্মুখে তুলে ধরেছে এবং নতুন সমাজ গঠনের পথ উন্মুক্ত করেছে। এভাবে সর্বদিক দিয়ে নতুন সমাজ গঠনের তাগিত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরোনো সমাজকে চুরমার করে নতুন সমাজ নির্মাণের এই তাগিদই হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের মৌল প্রেরণা। তাওহীদী দাওয়াতের এই প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রমের ফলে মক্কা এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের বহু সংখ্যক লোকের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ সম্ভবপর হয়।

ওদিকে হজ্বের মৌসুমে বাইরের গোত্রসমূহের লোকদের পক্ষেও এই তাওহীদী দাওয়াত কবুল করার সুযোগ ঘটে। সর্বোপরি মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা হজ্বের মৌসুমে মক্কায় এসে এ দাওয়াতের সাথে পরিচিত হয় এবং তাদের পরামর্শে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সুশিক্ষিত সাহাবী পাঠিয়ে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ফলে মক্কা ও মদীনা তদানীন্তন আরব উপদ্বীপ এর দুই প্রধান জনবসতিতে দীন ইসলামের বীজ অংকুরিত হয়ে একটি একক বৃক্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। এই বৃক্ষের বিলষ্ঠতা বিধান, তার ছায়া বিস্তার ও সেই ছায়ার তলে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত-বঞ্চিত মানবতাকে আশ্রয় দান এবং সেই সাথে তার সুমিষ্ট ফল দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে থাকা মজলুম ও বঞ্চিত মানবতার নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান সার্বভৌম আল্লাহরই নির্দেশক্রমে তাঁর আবাসস্থল পরিবর্তন করেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হন। অতঃপর তাঁর মদীনা কেন্দ্রিক জীবনে ইসলাম মতাদর্শের পর্যায় থেকে বাস্তব পর্যায়ে উন্নীত হয়, যে তাওহীদী আদর্শ তিনি সুদীর্ঘ তেরটি বছর পর্যন্ত মুখে প্রচার করেছেন

যার আলোকে লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মদীনায় তারই ভিত্তিতে তিনি একটি বাস্তব সমাজ গঠনের কার্যক্রম শুরু করে দেন। ইতিহাসে এই স্থান বদলকেই হিজরত বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজ বিপ্লবে হিজরত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিজরতের কিছুদিন পূর্বেই আল্লাহ তাআলা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর একান্ত নিজস্ব এলাকায় নিয়ে যান, দেখিয়ে দেন ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের অন্তরালে নিহিত বিশাল অদৃশ্যলোক সেখান থেকে ফিরে আসার পর পরই সূরা আল-ইসরার (বনী ইসরাইলের) ২৩ থেকে ৩৯ আয়াতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ১৪টি মৌলনীতি তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। এরই ভিত্তিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ইসলামী সমাজ কার্যত গঠন ও পরিচালনা করেন।

বাস্তব পর্যায়ে ইসলাম

হিজরতের ফলে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কা ও আশপাশের এলাকার মুসলমানদেরকে আপন বাড়ীঘর, জমি-জায়গা, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনেককে স্ত্রী-পুত্র, পরিজন ত্যাগ করে সর্বহারা ফকিরের ন্যায় মদীনার মত এক ক্ষুদ্র পরিসর বসতিতে উপস্থিত হতে হয়। এখানে তাদের ছিলনা আহার, বাসস্থান ও আয় উপার্জনের কোন নিজস্ব ব্যবস্থা। মদীনার বাসিন্দা মুসলিমগণ মুহাজির মুসলিমদের উদারভাবে গ্রহণ করলেন। তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় উপস্থিত হয়ে পর পর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দিলেন।

প্রথমত: তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। কেননা এই মসজিদই হচ্ছে ইসলামী সমাজের মিলন কেন্দ্র, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের বাস্তব ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত: তিনি মুহাজির ও মদীনার মুসলিম আনসারদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এই ভ্রাতৃত্বই হল ইসলামী সমাজ ও জাতি গঠনের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। এই ভ্রাতৃত্ব বংশ, বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও সন্তানের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমানের সূত্রে গ্রথিত করেই এই নতুন আদর্শবাদী জাতীয়তা রচিত হল। তাতে সুহাইব রুমী, বিলাল হাবশী ও সালমান ফারসী মক্কার কুরাইশ, আশেপাশের ঈমানদার এবং মদীনার আওস ও খাজরাজের লোকেরা সমাজ মর্যাদা ও অভিন্ন অধিকার লাভ করলেন। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব অনুসরণে বিভিন্ন গোত্র, বংশ, দেশ, বর্ণ ও ভাষার লোকেরা একাকার হয়ে গেল। নাযিল হল আল্লাহর ঘোষণাঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿77﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿78﴾ (سورة الحج)

হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের কঠোরতা আরোপ করেননি এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই

তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য স্বাক্ষী হও। (সূরা হজ্জঃ ৭৭-৭৮)

হিজরতের অব্যবহিত পরে নাযিল হওয়া কুরআন মজীদের এই আয়াতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া জনগণকে মুসলিম ও ইবরাহীমী মিল্লাত অর্থাৎ তাওহীদের অনুসারী জনগোষ্ঠী পরিচিতিতে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে পুরোনো সমাজের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠল এক নতুন সমাজ, পুরোনো সমাজ ছিল আদর্শহীন, চরিত্রহীন ও নেতৃত্বহীন। নতুন সমাজ তাওহীদী আদর্শের ভিত্তিতে ও সমাজের অবিসংবাদিত নেতা হচ্ছেন আল্লাহর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুরনো সমাজের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ও সে সমাজ নেতৃত্বের চির অবসান এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় যে কাজটি করেন, ঐতিহাসিকগণ মদীনা সনদ নামে তার উল্লেখ করেছেন, তাতে মুহাজির ও আনসারদের সাথে সাথে মদীনার প্রাচীন ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ইহুদীদের নাগরিক মর্যাদা, নাগরিক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে মদীনার সমাজে মুসলিম প্রাধান্য ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিরংকুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মদীনার প্রাচীন অধিবাসী আওস, খাজরাজ ও ইহুদী জনগণ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের মদীনায় উপনীত হওয়ার পূর্বে তাকে বাদশাহ রূপে বরণ করার জন্য মুকুটও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের সমাবেশ হওয়ায়, সর্বোপরি মদীনার লোকদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের সে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত একেবারে বানচাল হয়ে যায়। এর পরিবর্তে সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গড়ে উঠে, আর তাতে ইহুদীরা সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকের অধিকার পেয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কায়েম করা এ সমাজে সার্বভৌমত্ব কার্যকর ছিল একমাত্র আল্লাহর, নেতৃত্ব ছিল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর। সেখানে সব নাগরিক ছিলেন আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী। তাঁরা ছিলেন খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর বান্দা। আর এই-ই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপ।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থান গ্রহণ এবং সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও বায়তুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়ে নামায পড়তেন। কিন্তু মদীনাকে কেন্দ্র করে ইবরাহীমী মিল্লাতের প্রতিষ্ঠা লাভের পর বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত কাবাই কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হওয়া ছিল খুবই পছন্দনীয় এবং প্রয়োজনীয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাদানী জীবনের মোট ষোল মাস পর আল্লাহ তাআলা বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবাকে কিবলা বানিয়ে ওহী নাযিল করেনঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة : 144)

সুতরাং তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।(বাকারা : ১৪৪)

বস্তুত এ শুধু কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নয়। এ হচ্ছে সমগ্র আরব তথা বিশ্বের নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা। এর পূর্ব পর্যন্ত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কিবলা মুসলমানদেরও কিবলা ছিল, কিন্তু এবার মুসলমানদের কিবলা হয়ে গেলা কাবা তথা মসজিদুল হারাম। এর অর্থ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বিশ্বনেতৃত্ব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নেতৃত্বের অনুসারী মুসলমানদেরই বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহর নিকট থেকেই হয়ে গেল। তিনি আয়াত নাযিল করে তাঁর ঘোষণা দিলেন এ ভাষায়ঃ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة : 143)

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল স্বাক্ষী হন তোমাদের উপর।

অর্থাৎ তোমরা একই আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত জন সমাজ। তোমাদের সেই অভিন্ন আদর্শ ইসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নেতৃত্ব দান করেছেন তোমরা তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত আর এ কারণেই তোমরা বিশ্বমানবের নেতৃস্থানীয় হয়ে গেছে। ফল কথা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে থাকলেই তোমরা সর্বোত্তম ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠী হয়ে থাকবে। আর রাসূলের নেতৃত্ব অনুসরণ পরিহার করলে তোমরা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী হওয়ার অধিকারও থাকবে না তোমাদের। তখন তোমরা এক বিভ্রান্ত ও আদর্শবিচ্যুত জনতার ভিড়ে পরিণত হবে। তোমরা হবে অন্যান্য জাতি কর্তৃক নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও পদদলিত।

বর্তমান মুসলিম জাতির বাস্তব অবস্থা আয়াতটির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। সেই সাথে তা এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, তোমরা যদি আবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বের অনুসারী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পার, রাসূল কার্যতই তোমাদের জীবনে অনুসৃত হন তাহলে তোমরা আবার সর্বোন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারবে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্ট সামাজিক বিপ্লবের বিশেষত্ব

আরব উপদ্বিপে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্ট সমাজ বিপ্লব শুধু আরব দেশীয় বিপ্লব ছিলনা, তা ছিল বিশ্ব বিপ্লবেরই সূচনা ও প্রথম পর্যায় মাত্র। হযরত মুহাম্মদ কেবল মাত্র আরব দেশের জন্যই প্রেরিত হননি, কেবল আরবদেরই নবী ছিলেন না তিনি। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। সমগ্র বিশ্বে তাওহীদী বিপ্লব সৃষ্টিই ছিল তাঁর সম্মুখবর্তী কাজ। তিনি নিজে দৈহিক ভাবে জীবিত থেকে সমগ্র বিশ্বে কার্যত বিপ্লব সৃষ্টি করে যাননি একথা সত্য, কিন্তু আরব দেশের সীমিত পরিসরে যে আদর্শিক ও ঈমানী বিপ্লব তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তা বিশ্ব বিপ্লবেরই পূর্বাভাস এবং তারই সূচনা। তাওহীদী আকীদার ভিত্তিতে যে সমাজ বিপ্লবের পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা-ই বিশ্ব সমাজে আদর্শিক বিপ্লব সৃষ্টির দিগদর্শন। সে বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাত দুনিয়ার দেশে দেশে দেশ ভিত্তিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে থাকবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বে সেই তাওহীদী বিপ্লব সংগঠিত হয়ে বিশ্ব বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণতা

লাভ করে। এটা শুধু অন্ধ আকীদার ব্যাপার নয়। এর বাস্তব লক্ষণ ডুনিয়ার দিকে দিকে এখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব উপদ্বীপ কেন্দ্রিক যে বিপ্লবটা করে গেছেন ডুনিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাসে তা এক দৃষ্টান্তহীন ঘটনা।

সাধারণত ফরাসী বিপ্লবকে ডুনিয়ার সর্বপ্রথম সুসংগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব মনে করা হয়। কিন্তু আমি বলব ফরাসী বিপ্লব কোন সুসংগঠিত বিপ্লব ছিলনা, ছিলনা কোন পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। তা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ও ছিল না, পূর্বে সেজন্য কোন কর্মসূচী রচিত ও গৃহীত হয়নি। সে বিপ্লবের কোন নেতাও নির্বাচিত ছিলনা। ফলে ফরাসী বিপ্লব শুধু রাজতন্ত্র উৎখাতকারী একটি ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়েছে, সামাষ্টিক জীবনে কোন স্থায়ী কল্যাণ সৃষ্টি করা সেই বিপ্লবের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব ছিল ব্যাপক জনগণের সমর্থনহীন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক কর্মী ও সেনা বাহিনীর বিপ্লব, জোরপূর্বক কমিউনিজম চাপিয়ে দেয়ার বিপ্লব। সে বিপ্লবের ফলে পুরনো জার এর পরিবর্তে নতুন এক জারের ডুঃশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মানবতা সে নিপীড়নে জর্জরিত ছিল জার শাসনে, নতুন কমিউনিষ্ট শাসনে তার চাইতে ও অধিক নিষ্পেষন ও নির্যাতনের শৃংখলে আবদ্ধ হয় সে দেশের মানুষ। যে কমিউনিজমের কথা বলা হয়েছিল। বিপ্লবের সময় তা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মুহূর্তের তরেও কার্যকর বা বাস্তবায়িত হয়নি পৃথিবীর কোথাও। কিন্তু আরব উপদ্বীপে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় হয় তা ছিল তাওহীদী আকীদা ভিত্তিক এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদী বিপ্লব এবং সে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই বিপ্লব ক্রমিক পদ্ধতিতে সূচিত ও বাস্তবায়িত হয়। তা ছিল শিক্ষামূলক, জ্ঞান সমৃদ্ধ এবং গঠনমূলক (Constructive) প্রভাত সমীরণের ন্যায় তা সূচিত হয়ে ক্রমশ প্রবল ও প্রচন্ড রূপধারণ করে। নতুন চাঁদ আকাশের ভালে হাঁসুলির মত উদিত হয়ে আবর্তনের ধারায় যেমন পূর্ণশশীতে পরিণত হয় ঠিক তেমনি এই বিপ্লবে মৌল চিন্তা, পূর্ণ আদর্শ ও কর্মনীতি ও পদ্ধতি কোন এক ব্যক্তির চিন্তার ফসল ছিল না, তা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর দেয়া। তাই চিরন্তনতা তার বিশেষত্ব। এ বিপ্লবের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকে জ্ঞান চর্চার যে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তা শেষ দিন পর্যন্ত চলেছে, এখনও তা সেই জ্ঞান চর্চার কারণে শাশ্বত হয়ে আছে। এই বিপ্লব চলাকালে মাঝে মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও দেখা দিয়েছে। বিপ্লবকে পূর্ণতা দানের জন্য প্রতিরোধক শক্তিসমূহের বিষদাঁত চূর্ণ করাই তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, সে প্রয়োজন চিরদিনই থাকবে। কিন্তু মূলত ধ্বংসাত্মক (Destructive) নয়, গঠনমূলকতাই তার মৌল ভাবধারা।

এই বিশেষত্বের কারণে বিপ্লবের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে সমগ্র আরব উপদ্বীপ একটি আদর্শের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। বিপ্লবের বাণী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও বিশ্ব বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়। পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো শক্তিগুলোকে পেঁজাতুলার মত উড়িয়ে দেয়া হয়। পূর্ণত্বের সামনে অপূর্ণত্ব এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংঘটিত এ বিপ্লব ছিল রব্বানী বিপ্লব, আল্লাহ একমাত্র রব-মালিক, আইনদাতা, বিধান দাতা ও লালন-পালনকারী হওয়ার আকীদা ভিত্তিক বিপ্লব, মানুষকে মানুষের মালিকত্ব, আইন বিধানের কতৃত্ব ও লালন পালনকারীত্ব থেকে মুক্তিদানের বিপ্লব। তাই ইসলামী বিপ্লবের মৌলধারায় এই বিশ্বাস চির জাগরুক যে, সবকিছুর মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, সার্বভৌমত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র

তাঁরই আইন ও বিধান মানুষের উপর চলবে, একমাত্র তাঁরই বিধান চলবে যা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে নাযিল ও বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার। প্রয়োজনীয় অংশ প্রাপ্তি থেকে কোন একটি মানুষও বঞ্চিত থাকবে না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবে মানুষ নির্বিশেষে মর্যাদা ও অধিকার পেয়েছে, পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে তাওহীদী আদর্শ।

এ বিপ্লবেরই প্রয়োজন দুনিয়ার মানুষের জন্য। সেই প্রয়োজন যেমন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে তেমনি আজকের দিনেও সেই প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সর্ব প্রকারের আদর্শের, ইজমের ও বিপ্লবের চরম ব্যর্থতার পর এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে বর্তমানে।

তাই আমরা চাই আজও বাস্তবায়িত হোক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ, অনুসৃত হোক তাঁর পথ ও অভিমত, আর মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ভোগ করুক। আমীন।

সমাপ্ত